জীবনামৃত সিরিজ
নং—১ ৯ ৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

মূল্য তিন আনা।

জীবনামৃত সিরিজ

নং—১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন,
ঊষা, লবকুশ প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত



প্রকাশক—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

১৩৩২।

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র

PRINTED BY

ASHUTOSH MAJUMDAR.

AT THE

B. P. M'S PRESS.

22 5 B. Jhamapooker Lane, Calcutta. 1925.

ভূমিকা।

আজ আমরা তোমাদের নিকট একজন সাধকের কথা লিখিব। তাঁহার নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। কোন স্কুল কলেজে না পড়িয়া তিনি সমস্ত জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন মহা সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বনামধন্য মহাপুরুষ। ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনী পড়িলে তোমরা বুঝিতে পারিবে মানুষ এই সংসারে জন্মিয়া সাধনার দ্বারা কেমন করিয়া দেবতার সমান পবিত্র হইতে পারে।

ছেলেদের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুর-নামক গ্রামে ৺ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঔরসে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাহারা তিন ভাই, তন্মধ্যে তিনিই সকলের ছোট ছিলেন। তাঁহার অন্য দুই ভাইয়ের নাম রামকুমার ও রামেশ্বর।

বর্দ্ধমানের চৌদ্দ পনের ক্রোশ দক্ষিণে ও জাহানাবাদের (আধুনিক আরাম্বাগ) পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে "দেরে" গ্রাম ক্ষুদিরামের আদি নিবাস। কিন্তু সেখানকার জমিদার ক্ষুদিরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নানা-প্রকারে প্রলুব্ধ করায় ক্ষুদিরাম আপন ধর্ম্ম—আপন সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য "দেরে' গ্রাম ত্যাগ করিয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্ষুদিরাম অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, যজমানের ক্রিয়া করিয়া অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেন; কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর অন্তঃকরণ এরূপ উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণান্তেও কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না কিংবা কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ কেহ কিছু দান করিতে আসিলে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিতেন। এইরূপ উচ্চান্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া এবং নিঃস্বার্থ পরসেবাব্রতধারী বলিয়া গ্রামবাসিবৃন্দ তাঁহাদিগকে দেবতার মত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিত।

রামকৃষ্ণের মায়ের নাম চন্দ্রমণি। চন্দ্রমণি পাতিব্রত্যে, শিষ্টতায়, অতিথি-সেবায় এমনই আদর্শস্থানীয়া ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া ভক্তি করিত। নিজে না খাইয়া গৃহাগত অতিথিকে অন্নের থালা ধরিয়া দিতে পারিলে চন্দ্রমণি খুব আহ্লাদিত হইতেন।

একদা বেলা দ্বিপ্রহরে ক্ষুদিরাম আহারান্তে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, চন্দ্রমণি স্বামীর প্রসাদ পাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রমণি অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া হাঁড়িতে যাহা কিছু অন্ন ছিল, তাহা অতিথিকে দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত, অতিথি চন্দ্রমণির আতিথ্য-সৎকারে প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া দুই বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন "মা তোমার গর্ভে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে—দেবতার ন্যায় তোমার বংশ চিরকাল হিন্দু-নরনারীর শ্রদ্ধা ও পূজা পাইবে।"

অতিথির কথা বিফল হইল না। চন্দ্রমণি অচিরাৎ গর্ভবতী হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে এক সুন্দর সুঠাম পুত্র-সন্তান প্রসূত হইল—চন্দ্রমণির আঁধার ক্রোড় সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—যুগান্তের আঁধার যেন মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল।

ক্রমে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন শিশু রামকৃষ্ণ বাড়িতে লাগিলেন। সেই সদানন্দময় অপূর্ব্ব শিশুর মুখে মধুর হাস্য—আধ-আধ মধুর ভাষ দেখিতে ও শুনিতে সকলেরই প্রাণ আকুল হইতে লাগিল। সকলেই শিশুটীর নাম রাখিলেন **গদাধর।**

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় গদাধরকে পাঠশালায় পড়িতে পাঠান হইল। তাঁহার সংসর্গে দুষ্ট বালক শিষ্ট হইল—মিথ্যাবাদী সত্যবাদী হইল।

গুরু মহাশয় পাঠ দিতেন, গদাধর ফুল লইয়া মাটীর ঠাকুর রচনা করিয়া কেবল পূজার্চ্চনাই করিতেন। শিশুর এই ধূলা-খেলায় মহামায়া কি খেলা খেলিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। গুরুমহাশয় কিন্তু বুঝিলেন গদাধর সামান্য শিশু নহে।

গ্রামের মধ্যে জমিদার বাবুদের অতিথিশালায় প্রায়ই পুরাণপাঠ ও কথকতা হইত; গদাধর একমনে তাহা আগাগোড়া শুনিতেন। এই ভাবে গদাধর ক্রমে অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলেন—তখন ক্ষুদিরাম মারা গেলেন। পিতৃবিয়োগের পর গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিভাবকতায় আরও নয় বৎসর গ্রামে অবস্থান করিয়া সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলিকাতা নগরীতে বড় ভাই রামকুমারের সহিত আগমন করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া গদাধর ভ্রাতার সঙ্গে প্রথমে কিছুদিন নাথের বাগানে রহিলেন, তারপর ঝামাপুকুরে আসিয়া গোবিন্দ চটোপাধ্যায়ের গৃহে থাকিয়া পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার অনেক স্থলেই রামকুমারের শিষ্য-সেবক ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। সুতরাং সে সকল স্থানে রামকুমারের ন্যায় গদাধরও লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান-সমাদর পাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ গদাধরের স্বভাব-চরিত্র দেখিলে সকলেই তাঁহার প্রতি আপনা হইতেই আকৃষ্ট হইয়া বশীভূত হইতে লাগিলেন।

দুই ভাই কলিকাতায় থাকিয়া লোকের বাড়ী ঠাকুর পূজা করেন, ক্রিয়া কর্ম্ম করান, সকল ধর্ম্মকর্ম্মেই আহূত হইয়া গমন করেন। এইরূপ করিতে করিতে গদাধরের স্বভাব এমন হইয়া পড়িল যে ধর্ম্মচর্চ্চা ও ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চ্চনা ভিন্ন সংসারের আর কোন কথাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। সর্ব্বদাই উদাসীনের মত থাকিয়া কেবল সেই সকল

কর্ম্ম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দেখিয়া শুনিয়া রামকুমার মনে মনে চিন্তিত হইলেন।

গদাধরের সংসারে মন নাই—উপার্জ্জনের চেষ্টা নাই—নিজের ভোগ-বিলাসের স্পৃহা নাই—সর্ব্বদাই কেবল ঠাকুর দেবতার পূজা-আরাধনা—অষ্টপ্রহর কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা। বলিলেও গ্রাহ্য নাই—বকিলেও দুঃখ নাই—মারিলেও পরিবর্ত্তন নাই—যেন প্রহ্লাদ।

কলিকাতার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির গৃহে পণ্ডিত রামকুমার ও গদাধরের অবারিত দ্বার ছিল—রাসমণি ভ্রাতৃদ্বয়কে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে পুণ্যশ্লোকা রাণী তাঁহার দক্ষিণেশ্বর-বাগান বাড়ীতে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রামকুমারকে তাহার পূজারী নিযুক্ত করিলেন। কনিষ্ঠ গদাধরও (পরে রামকৃষ্ণ) জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিয়া সেখানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণেশ্বর যেন স্বর্গের অমরাবতী। নিম্নে গঙ্গা—গঙ্গাগর্ভ হইতে সুন্দর প্রশস্ত সোপান উপরে উঠিয়াছে—সোপানের দুই পার্শ্বে দক্ষিণে ও বামে মনোহর ফুলের বাগান—তৎপরে দ্বাদশটি শিব-মন্দির।

ঘাটের চাতালের সম্মুখে সুন্দর সুপ্রশস্ত বাঁধা রাস্তা—তাহার শেষে প্রশস্ত সুন্দর তোরণ, আর তোরণের পরই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের তিনদিকে বিস্তৃত অতিথিশালা এবং দক্ষিণের দিকে নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের উত্তরে কালী মন্দির—শাক্ত ও শৈব দুই ভাই গলাগলি করিয়া দণ্ডায়মান। এই শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র উপবনে মায়ের চরণতলে আসিয়া গদাধরের সমস্ত মন প্রাণ একেবারে উদাস, বিভোর, তন্ময় হইয়া গেল।

এই সময় হইতে ভগবান্‌কে লাভ করিবার চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয়। কি করিলে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে—কি করিলে সেই সত্য সুন্দর প্রেমময় ভগবানের পদ-লাভ করা যায়, রামকৃষ্ণের মনে অহোরাত্র কেবল সেই চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। অনেক সময় তিনি দৈনিক পূজা পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া যাইতেন এবং কেবল এই বলিয়া মায়ের সম্মুখে ক্রন্দন করিতেন—"মাগো, আমার এই অল্প জীবনের এত দিন ত বৃথা গেল, তবুও তুমি আসিলে না।" এই সময়ে কোন্ ভাবে যে দিন যাইত এবং কোন্ সময়ে যে রাত্রি প্রভাত হইত, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না। কখন কখন বা একাদিক্রমে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল কাঁদিতেন আর বলিতেন, "মা! আমায় দেখা দাও—আমি যে কেবল তোমাকেই চাই।"

রামকৃষ্ণ কামিনী ও কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এই দুইটি ত্যাগ না করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহাকে সংসারপাশে বাঁধিবার জন্য রামকুমার সারদা নাম্নী একটি ছয় বৎসর বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল নদীর বেগ কি সামান্য বালির বাঁধে বাধা দিতে পারে? রামকৃষ্ণ বিবাহান্তে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কালী নামে মাতিয়া উঠিলেন। তিনি একদা তাঁহার স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমার সহিত তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ ভুলিয়া যাও এবং আমাকে অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমি একান্তমনে মায়ের পূজা করিতে পারি।" সারদাদেবী তাঁহাকে নানাবিধ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া মাতৃ-পূজার অনুমতি দিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যদশায় তাঁহার স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ কালীনামে এত মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন যে, তিনি আপন শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তিনি অনেক সময় আপন দেহের দিকে তাকাইয়া বলিতেন "এই দেহ ত দেহ নয়, এ যেন আমার মায়ের বাসভূমি।" এই ভাবে নিশিদিন বহির্জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া একমনে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে মহাত্মা রামকৃষ্ণ সত্য সত্যই তাঁহার দর্শন পাইলেন। পূজা করিতে বসিয়াছেন—সে পূজার আর বিশ্রাম নাই—অন্ত নাই—পূজা করিয়াই যাইতেছেন। পূজা করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত গদাধর মায়ের পূজার ফুল আপনায় মাথার উপরেই দিতেছেন। আরতি করিতে উঠিলেন ত আরতি করিতেই লাগিলেন। বিশ্রাম নাই—শেষ নাই—অবিশ্রান্ত ভাবে আরতি করিয়াই যাইতে লাগিলেন। সে আরতি আর যে কখনও শেষ হইবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না। আর ধ্যান করিতে বসিলেন তো একেবারে জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য। দিবা নাই—রাত্রি নাই—স্থান নাই—অস্থান নাই—যেস্থানে ধ্যানে বসিলেন সেইস্থানেই একেবারে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন—আবার যে কখনও সে ধ্যান ভাঙ্গিয়া জ্ঞান ফিরিবে সে আশা কাহারও মনে রহিল না। গদাধরের তপ নাই, জপ নাই, পূজা নাই, অর্চ্চনা নাই, ক্রিয়া নাই, কর্ম্ম নাই,—নিশিদিন কেবল আকুল ভাবে "মা" "মা" করিয়া ছুটিয়া বেড়ান। দেখিয়া শুনিয়া রাণী রাসমণি পূজার জন্য অন্য পূজারী নিযুক্ত করিলেন এবং রামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন।

ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধে ভ্রমর সকল আপনি দলে দলে ছুটিয়া আসে; সুতরাং রামকৃষ্ণের হৃদয়ে যখন কালীমাতা আসন পাতিয়া

বসিলেন, তখন দেশে বিদেশে সকলেই জানিতে পারিল যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তখন দলে দলে বহু লোক রামকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে ছুটিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহাকে সাধু বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—আবার কেহ বা পাগল বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে তোতাপুরী নামে একজন পশ্চিমদেশবাসী সিদ্ধপুরুষ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—প্রথম দর্শনেই বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ সত্য সত্যই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তিনি রামকৃষ্ণকে এগার মাস যাবৎ বেদান্তের দুরূহ ব্যাখ্যা শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণের চোখ দিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল—এমনই ভক্ত তিনি!

একদিন একজন হরিভক্ত তাঁহাকে কলুটোলার হরিসভায় লইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ হরিনাম শুনিতে শুনিতে কখনো আত্মহারা হইয়া ধূলায় লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন—কখনো "শ্রীগৌরাঙ্গ" "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন—অবশেষে নিজেই গিয়া গৌরাঙ্গের আসনে উপবেশন করিলেন।

রামকৃষ্ণ আপনার মাতা চন্দ্রমণিকে জগজ্জননী কালী মায়ের অংশ ও রূপান্তর বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। জেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মাতাকে কামারপুকুর হইতে আনাইয়া আপনার কাছে রাখিলেন এবং সেইরূপ ভাবিয়াই তাঁহার পূজা ও সেবা করিতে লাগিলেন।

শেষে তাঁহার মন হইতে অহঙ্কার দূর হইল—আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। একজন মুসলমান ফকির তাঁহাকে

ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, রামকৃষ্ণ কোরাণের মতানুসারে নমাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন—

"ভিন্ন ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন মত
কিন্তু এক গম্য স্থল"—

শুধু ইহাই নহে, রামকৃষ্ণ খৃষ্টধর্ম্মও গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে তিনি জগতের সমস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মমতই সমর্থন করিতেন। কখনও বা তিনি বৃন্দাবনের গোপললনাগণের বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন, আবার কখনও বা তিনি হনুমানের সাজে গাছের উপর বসিয়া "রাম" "রাম" করিতেন এবং হনুমানের ন্যায় গাছের কলা খাইতেন। এইরূপে নানাভাবে নানা ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানের উপাসনা করিয়া তিনি জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল যাপন করিলেন।

রামকৃষ্ণ, যে একজন প্রকৃত সাধক, তাহা বেশীদিন অজ্ঞাত রহিল না। তখন দলে দলে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় লোক তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন, তরুণ যুবক বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্র দত্ত) বি, এ পাশ করিলেও প্রাচীনযুগের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছাত্রের মত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সূর্য্য যেমন আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলের বাটীতে সমানভাবে কিরণ প্রদান করেন, রামকৃষ্ণ তেমনি জাতিবর্ণ-বিচার না করিয়া সকলকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন কি, যখন তাঁহার কথা বলিবার শক্তি প্রায় রুদ্ধ হইয়াছিল, তখনও

তিনি জ্ঞান-পিপাসুগণকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে দিতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে তিরোহিত হন।

তিরোধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ আমি মাকে কহিতেছিলাম যে, আমি আর লোকের সহিত কথা কহিতে পারি না। আমার শিষ্যগণকে একটু শক্তি দে, ইহারা উপদেশ দিয়া প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।"

ইহার কিছুদিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিলেন। ক্রমে বেদনাবৃদ্ধি হওয়ায় গলাধঃকরণ করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। এই বেদনা ক্রমে স্ফোটকে পরিণত হইল। গলনালী ফাটিয়া উহা হইতে পূঁয নির্গত হইতে লাগিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল, অবশেষে দীর্ঘকাল দুঃসাধ্য ব্যাধি ভোগ করিবার পর রামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করিলেন।

রামকৃষ্ণের মন নিত্যপ্রেমময় ছিল—চক্ষুর অগোচর সামান্য কীট হইতে বৃহত্তম জীবে পর্য্যন্ত তাঁহার সমান প্রেম ছিল। ভগবানকে মাতৃস্বরূপে দর্শনের অদম্য অধ্যবসায় ও চেষ্টা দ্বারা তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা সূচিত হয়। তিনি জানিতেন "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর", তাই তিনি বৃথা তর্ক-বিতর্কের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার পরিধেয় পরিচ্ছদ অতি সাদাসিদা ছিল, তাঁহার চালচলনও অতি সাধারণ ছিল। তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় আর কি দিব? তাঁহার উপদেশাবলীর প্রত্যেক শব্দে তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিলে দ্রষ্টার হৃদয় হইতে তৎক্ষণাৎ পার্থিব ঐশ্বর্য্যচিন্তা দূর হইয়া যাইত ও বিশুদ্ধ ভগবচ্চিন্তার উদয় হইত।

রামকৃষ্ণ সময়ে সময়ে বড় কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন, এজন্য তাঁহার বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিতেও কেহ কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই "সাধুত্বে দুর্জ্জনঃ জনঃ"দের জানা উচিত, ভগবান্ রামকৃষ্ণ, জগতের কোন্‌টি ভাল বা কোন্‌টি মন্দ তাহা জানিতেন না। আমার বা তোমার নিকট উলঙ্গ হওয়া লজ্জার বিষয়, কিন্তু লজ্জাবোধহীন একটি শিশুর পক্ষে তাহা লজ্জার বিষয় নহে। কেন না, সে মানবদেহের কোন্‌টী গোপনীয়, কোন্‌টী প্রকাশ্য স্থান, তাহা জানে না। রামকৃষ্ণও বহির্জগতের ভাল মন্দ বিষয়ে শিশুর ন্যায় অজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে যে সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা সরল ভাষায় লোককে বুঝাইবার জন্য যদি তিনি কোন সময়ে "অসাধু ভাষা"র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহা দোষের নহে। বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করায় কেহ কেহ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমাও লেপন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, রামকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করিবার আগে তাঁহার স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে একদা একটি গল্প বলিয়াছিলেন। সেই গল্প হইতেই তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুবিধা হয়। গল্পটী এই—"একদিন তিন বন্ধু একটা সুন্দর উদ্যানের নাম শুনিয়া, তাহা দেখিবার জন্য যায়। তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিবার পর অবশেষে উদ্যানের নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখে যে, একটা উচ্চ প্রাচীর পার হওয়া আবশ্যক। তখন তাহারা তিন জনে অতিকষ্টে প্রাচীরের উপরিভাগে উঠে। তন্মধ্যে দুইজন উদ্যানের শোভা-দর্শনে আত্মহারা হইয়া লম্ফ প্রদান করিয়া উদ্যানে

প্রবেশ করে, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি যদিও অন্য দুইজনের ন্যায় উদ্যানের শোভারাশিতে বিমুগ্ধ হইল, তথাপি সে তাহার প্রতিবেশীদিগকে সেই উদ্যানের শোভা-সৌন্দর্য্য ও তথায় পৌছিবার পথ বলিয়া দিবার জন্য আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিল।"

রামকৃষ্ণ এই গল্পটীর অবতারণা করিয়া প্রায়ই তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন, "দেখ, যে সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষ কোলাহলময় সংসারে থাকিয়া জীবকে তত্ত্বজ্ঞান শিখাইবার জন্য প্রয়াস করেন, নির্জ্জনে যাইয়া ভগবচ্চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইতে চান না, তাঁহারা গল্পে বর্ণিত তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায়। আর যে সমস্ত সাধক, শত সহস্র দুঃখদৈন্য-প্রপীড়িত জীবের বিষয়ে উদাসীন হইয়া সমাধি লাভ করেন, তাঁহারা গল্পে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির ন্যায়। যে সাধক সহস্র আর্ত্তের উদ্ধারার্থ লোকসমাজের মধ্যে বাস করেন, তিনি সমাধিপ্রাপ্ত নির্জ্জনস্থ সাধু অপেক্ষা কোনও অংশে ধর্ম্ম ও তত্ত্বজগতে হীন নহেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগবানের দর্শনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনটী উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। (১) সময়ে সময়ে নির্জ্জনস্থানে যাইয়া ভগবানের ধ্যান-ধারণা (২) ভগবানের নাম-জপ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার বিগ্রহাদির সেবা আর (৩) ঐকান্তিক প্রার্থনা। ভগবান্ রামকৃষ্ণ বলেন, "কেহ তোমার অপকার করিলে প্রতিশোধ লইও না। কেবল বাহ্যতঃ একটা বাধা দেখাইয়া অপকারীর হাত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিও।" জীবনে মুক্তিলাভ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া কখনও মুক্তিলাভ করা যায় না, কারণ পুস্তকাধ্যায়ী কেবল "কে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং কেন এই সৃষ্টি" এই তত্ত্ব লইয়া বিচার-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, পক্ষান্তরে নিরক্ষর লোক এই সমস্ত যুক্তি তর্ক না

তুলিয়া ভগবানের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার প্রেমসাগরে ডুবিয়া সুধা পান করে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের যুক্তি অতি সুন্দর। তিনি বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বস্তু। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন একই বস্তু, জীবাত্মা ও পরমাত্মাও তেমনি একই বস্তু। নিম্নে তোমাদের রামকৃষ্ণ দেবের কয়েকটি উপদেশ শুনাইতেছি।

উপদেশাবলী।



এরূপ ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে পরমহংসদেবের সমগ্র উপদেশাবলীর স্থান সংকুলান অসম্ভব হইলেও এস্থলে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য উপদেশ লিপি-বদ্ধ করিতেছি—

(১) একটি লোক একটি কল্পবৃক্ষের নীচে বসিয়া রাজা হইতে ইচ্ছা করিল, অমনি সে রাজা হইল। পর মুহূর্ত্তে সে একটি সুন্দরী বালিকা পাইতে ইচ্ছা করিল, তৎক্ষণাৎ দেখিল—একটি অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা তাহার পার্শ্বে। তাহার পর সে মনে মনে ভাবিল, আচ্ছা এখন যদি একটি বাঘ আসিয়া আমাকে খাইয়া ফেলে। এই চিন্তা করিতে করিতেই একটী বাঘ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। ঈশ্বর কল্পবৃক্ষের ন্যায়। যে মনে করে "আমি গরীব ভাগ্যহীন", সে সেইরূপ গরীবই থাকে, আর যে বিশ্বাস করে যে "ভগবান্ আমার সব অভাব দূর করিবেন," সে তাঁহার নিকট যাহা চায় তাহাই পায়।

(২) শিক্ষক ছাত্রকে শিখাইলেন, দেখ—"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটী ঈশ্বর।" ছাত্র এ কথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিল না। একদিন সে পথে যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিল—একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাহার সম্মুখে আসিতেছে। হস্তীর মাহুত তাহাকে বার বার সরিয়া যাইতে বলিল। ছাত্রটী মনে মনে ভাবিল, "কেন আমি সরিব? আমিও ঈশ্বর, ঐ হাতীটাও ঈশ্বর।" এই ভাবিয়া সে রাস্তা ছাড়িয়া সরিল না। তখন হাতীটী তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা ধরিয়া বিশেষ রকম আঘাত দিল।

ছাত্র তাহার শিক্ষকের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে শিক্ষক বলিলেন, "বেশ! তুমি ঈশ্বর, হাতীটীও ঈশ্বর, ইহা মানিলাম; কিন্তু ঐ মাহুতরূপী ঈশ্বর তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছিল, তুমি সেই মাহুতরূপী ঈশ্বরের কথা শোন নাই কেন? তাহার কথা না শুনায় আঘাত পাইয়াছ।"

(৩) ঈশ্বর এক,—কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি নানারূপ। যেমন কোন সংসারের কর্ত্তা তাঁহার পুত্রের নিকট পিতা, ভাইয়ের নিকট ভ্রাতা, স্ত্রীর নিকট স্বামী—এই ভাবে একই ঈশ্বর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের নিকট ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেন।

(৪) জলকে যেমন কেহ 'জল', কেহ 'বারি', কেহ 'একোয়া' এবং কেহ 'পানি' বলে, তেমনি একই "সৎ—চিৎ—আনন্দকে" কেহ গড্, কেহ আল্লা, কেহ হরি এবং কেহ ব্রহ্ম বলে।

(৫) বালকেরা যেমন হিজি বিজি লিখিতে লিখিতে ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট অক্ষর সুন্দররূপে লিখিতে শিখে, সেইরূপ আমাদিগকে প্রথমতঃ একটী সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া মন স্থির করিয়া লইতে হইবে, তারপর যখন সাকারে আমাদের মন স্থির হইবে, তখন নিরাকারে আমরা মন স্থির করিতে পারিব।

(৬) যখন কোন বড় কাষ্ঠখণ্ড নদীতে ভাসিয়া যায়, তখন তাহার উপর শত শত লোক উঠিলেও তাহা ডুবে না, কিন্তু একটা পাটকাটী সামান্য একটী কাকের ভরে ডুবিয়া যায়। সেইরূপ ভগবান্ যখন অবতাররূপে আবির্ভূত হন, তখন অসংখ্য লোক তাঁহার আশ্রয়ে মুক্ত হয়। সিদ্ধপুরুষেরা কেবল কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনাদিগকে মুক্ত করেন।

(৭) বন্যা যখন আসে, তখন সেই বন্যার জলে নদী, হ্রদ, তড়াগাদি সমস্ত প্লাবিত হয়, সেইরূপ যখন ভগবান্ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সকলেই তাঁহার দয়ায় উদ্ধার পায়। সিদ্ধ যোগীরা কেবল আপনাদিগকে কঠোর তপস্যা দ্বারা উদ্ধার করেন।

(৮) "হোমা" নামে একপ্রকার পাখী আছে, তাহারা আকাশের খুব উচ্চস্তরে বাস করে; তাহারা সেই স্থানকে এত ভালবাসে যে কখনও নীচে আসে না। তাহারা আকাশেই ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডিম্ব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির দ্বারা নিম্নাভিমুখে আসিবার সময় মধ্যপথে তাহা হইতে ছানা জন্মগ্রহণ মাত্রেই ডানা নাড়িয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে উড়িতে থাকে। শুকদেব, নারদ, যীশু, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এই হোমাপাখীর ন্যায়। ইঁহারা সকলেই বাল্যকালে পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উচ্চাভিমুখে মনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মহাত্মাদিগকে "নিত্যসিদ্ধ" বলে।

(৯) স্পর্শমণিসংযোগে ইস্পাতনির্ম্মিত তরবারিও সোণার তরবারিতে পরিণত হয়। সোণার তরবারিতে পরিণত হইলেও তরবারির পূর্ব্ব আকারই থাকে; কিন্তু তখন আর তাহার কোন বস্তু কাটিবার ক্ষমতা থাকে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি ভগবানের চরণ-রজোলাভে ধন্য হইয়াছে—তাহার দৈহিক আকার-প্রকারের পরিবর্ত্তন না হইলেও, সে তখন আর কারো কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

(১০) দুগ্ধ ও জল একত্র মিশাইলে দুগ্ধকে আর পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ যে সমস্ত নবীন লোক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চান, তাঁহারা সাধু-অসাধু-নির্ব্বিশেষে সাংসারিক লোকের সহিত মিশিলে,

ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের হৃদয় হইতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, স্নেহ, দয়া, প্রেম, উৎসাহ প্রভৃতি পরোক্ষভাবে দূরীভূত হয়, কিন্তু দুধকে মাখনে পরিণত করিলে তাহা যেমন জলের উপর ভাসিতে থাকে, কখনো ডুবে না, সেইরূপ মানুষের মনও যখন ভগবানের ধ্যানে দৃঢ় হয়, তখন সে যে কোন সংসর্গে মিশিলেও তাহার মন কলুষিত হয় না—কুসংসর্গ তখন আর তাহার মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না।

(১১) মানুষ যতদিন "হে আল্লা," "ও গড" "হে হরি" বলিয়া চীৎকার করে, ততদিন সে ভগবানের সাক্ষাৎ পায় নাই জানিবে, কারণ যে ভগবানের সাক্ষাৎ পায়, সে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে।

(১২) মৌমাছি যতক্ষণ পদ্মের মধুর আস্বাদ না পায়, ততক্ষণই সে ফুলের চতুর্দ্দিকে "গুন্ গুন্" করিয়া বেড়ায়; কিন্তু পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলে সে নিঃশব্দে মধুপান করিতে থাকে। লোকে যতদিন ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া বাদানুবাদ করিতে থাকে—ততদিন সে বিশ্বাসের মধুর আস্বাদন পায় নাই—জানিতে হইবে। যখন সে সত্য বিশ্বাসের আস্বাদ পায়, তখন সে নীরব হয়।

(১৩) কোন কোন জলচর পক্ষী জলে ডুব দিলেও যেমন তাহার শরীর জলসিক্ত হয় না, সেইরূপ মুক্তপুরুষেরা সংসারে বাস করিলেও সংসারের সুখদুঃখ, আসক্তি অনাসক্তি তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না।

(১৪) ভগবদ্ভক্তেরা দেবতাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে এত আনন্দ পান কেন? কারণ মায়ের নিকটই আবদার চলে। কাজেই ভগবানের মাতৃমূর্ত্তিই সাধকের এত প্রিয়।

(১৫) সাংসারিক লোকেরা যশঃ ও প্রতিপত্তির জন্য অনেক পুণ্য ও দানাদি কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু যেই তা'দের অবস্থা মন্দ হয়, সেই তা'রা সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলিয়া যায়। ইহারা ঠিক তোতা পাখীর ন্যায় নহে কি? তোতাপাখী সারাজীবন "রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলে, কিন্তু যেই তাকে বিড়ালে কামড়াইয়া ধরে, অমনি সে "কঁ্যা" "কঁ্যা" করিয়া ডাকিতে থাকে সে "রাধাকৃষ্ণ" নাম ভুলিয়া যায়।

(১৬) ছোট ছোট শিশুরা যেখানে সেখানে পুতুল লইয়া খেলা করিতে থাকে, কিন্তু যেই তাহাদের "মা" আসেন, অমনি "মা" "মা" বলিয়া তাহাদের মায়ের কোলে দৌড়িয়া যায়। তোমরাও এখন নিরুদ্বেগে সংসারের মধ্যে পার্থিব ধন, যশঃ সম্মান প্রভৃতির পুতুল লইয়া খেলা করিতেছ, কিন্তু যদি তোমরা একবার আদ্যাশক্তি মহা-মায়ার দর্শন পাও, তখন এই পার্থিব ধন, যশঃ, সম্মান আর তোমাদের ভাল লাগিবেনা; তখন তোমরা এ সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইবে।

(১৭) মনে কর, তিন রকমের পুতুল আছে, প্রথমটি লবণে, দ্বিতীয়টী কাপড়ে এবং তৃতীয়টী পাথরে প্রস্তুত। যদি এই তিনটী পুতুলকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রথমটি অর্থাৎ লবণের পুতুলটী তৎক্ষণাৎ গলিয়া যাইবে, তাহার আকৃতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে; দ্বিতীয়টীর অর্থাৎ কাপড়ে তৈয়ারী পুতুলটীর সর্ব্বাঙ্গই সিক্ত হইবে কিন্তু তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে না; তৃতীয়টী অর্থাৎ প্রস্তরনির্ম্মিত পুতুলটীর কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারা এই লবণের পুতুলটীর মত, তাঁহারা পরমাত্মাতে মিশিয়া এক হইয়া যান। যাহারা ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহারা এই কাপড়ের পুতুলের ন্যায়, তাঁহারা ভগ-

বানের নামে ও ভক্তিতে একেবারে আর্দ্র—ভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁহাদের নয়ন সিক্ত হয়—হৃদয় দ্রবীভূত হয়। আর যাহারা সাংসারিক লোক, তাহারা এই প্রস্তরনির্ম্মিত পুতুলের ন্যায়, ইহারা তত্ত্বজ্ঞানের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না।

(১৮) দুইটি লোক একটি উদ্যানে গেল। তন্মধ্যে যে সাংসারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, সে উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই তন্মধ্যে কয়টি আমের গাছ আছে, প্রত্যেক গাছে কয়টি আম আছে এবং আমগুলির মূল্য কত হইতে পারে, তাহা গণনা করিতে লাগিল। অন্যজন ইত্যবসরে বাগানের মালিকের নিকট যাইয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিল এবং তাহার নিকট হইতে আম খাইবার অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে গাছতলায় যাইয়া আম পাড়িয়া খাইতে লাগিল। এক্ষণে বিচার কর দেখি, দুইজনের মধ্যে কে অধিক জ্ঞানী? আম খাও, তাহাতে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে; কিন্তু বৃথা কতটা আমগাছ ও কতগুলি আম ইহা গণনায় লাভ কি? সাংসারিক অজ্ঞ লোকে "কে ভগবান্" ইত্যাদি প্রকারের বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত করে, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ভগবানের সহিত পরিচয় করিয়া পৃথিবীতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভোগ করিতে থাকেন।

(১৯) লোকে বলে যে রাজর্ষি জনক যখন সংসারে থাকিয়া "তত্ত্বজ্ঞান" লাভ করিতে পারিলেন, তখন তাহারা পারিবে না কেন? কিন্তু আমি বলি, রাজর্ষিজনক বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি, সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ একটীমাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। সাধারণ নিয়ম এই যে, লোভ ও বিলাস ত্যাগ না করিলে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। তোমরা আপনাদিগকে "জনক" মনে

করিও না; কত যুগযুগান্তর গিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় একটি জনকের আবির্ভাব হইয়াছে কি?

(২০) শুক্তি হইতে মুক্তা গ্রহণ করিয়া শুক্তি যেমন লোক দূরে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিবে; গুরুর বাহ্য মূর্ত্তি যাহাই হউক্ না কেন, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।

(২১) বিদেশগামী পথিক যেমন অজ্ঞাত স্থানে একজনের পরিবর্ত্তে নানাজনের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে নানাজনের নানা কথায় প্রায়ই তাঁহার পথভ্রম ঘটে, সেইরূপ যাঁহারা ভগবানকে পাইতে চান, তাঁহারা নানাজনের নানামত না শুনিয়া একমাত্র "গুরুর" উপদেশানুসারে চলিবেন।

(২২) রাজা যেমন তাঁহার ভৃত্যের গৃহে যাইবার পূর্ব্বে রাজসিংহাসন, উপাদেয় খাদ্যসম্ভার ও অলঙ্কারাদি প্রেরণ করেন, কেননা, তাহা হইলে ভৃত্য তাঁহাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিতে পারিবে, সেইরূপ ভগবানও অবতাররূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ভক্তের হৃদয়ে প্রেম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দান করেন।

(২৩) ঘরে আলো প্রবেশ করিলে যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে যুগযুগান্তরের অন্ধকারও বিদূরিত হয়, সেইরূপ ভগবানের একটুমাত্র কৃপাকটাক্ষে সহস্র সহস্র জন্মের পাপরাশি দূরীভূত হয়।

(২৪) ফল যখন পাকে, তখন তাহা আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে, আর ঐ পাকা ফল খাইতে অতি সুস্বাদু হয়, কিন্তু কাঁচা ফল পাড়িয়া কৃত্রিমভাবে পাকাইলে তাহা তত সুমিষ্ট হয় না। সেইরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার নিকট জাতিভেদ আপনা হইতেই দূরীভূত

হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ যতদিন না ঘটে, ততদিন তাহার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে।

(২৫) প্রশ্ন ঃ—বর্ত্তমানকালের ধর্ম্মপ্রচার-প্রণালী সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উঃ।—অন্যের নিকট ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া কেহ যদি সেই সময়টুকু শুধু ভগবানের উপাসনা করে, সেই যথেষ্ট ধর্ম্মপ্রচার। যে নিজেকে মায়া-মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া নিজে জীবন্মুক্ত হইতে পারে, শত শত ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। ফুল যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে মৌমাছি সকল অনাহূত অবস্থায় তথায় উপস্থিত হয়।

(২৬) প্রশ্ন ঃ—আপনার স্ত্রীকে লইয়া আপনি সাংসারিক জীবন যাপন করেন না কেন?

উঃ।—সুরসেনানী কার্ত্তিকেয় একদিন একটি বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিয়াছিলেন। বাড়ীতে যাইয়া দেখেন, তাঁহার মা ভগবতীর গণ্ডস্থলে বিড়ালের আঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার গণ্ডস্থলে এরূপ আঁচড় লাগিল কিরূপে?" ভগবতী দুর্গা উত্তর করিলেন, "বাবা, এ তোমার নিজের কাজ।" কার্ত্তিকেয় অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ মা?" ভগবতী বলিলেন, "আজ সকালে তুমি একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিয়াছিলে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?" কার্ত্তিকেয় বলিলেন, "হাঁ আমি একটি বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার গণ্ডদেশে আঁচড় লাগিল কিরূপে?" দুর্গা উত্তর করিলেন "বাবা জানিও, এ জগতে আমি ছাড়া কিছুই নাই। আমিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। তোমরা

যাহাকেই আঘাত কর না কেন, তাহা আমাকেই করা হয়।” কার্ত্তিকেয় এই কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; কারণ কাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন, প্রত্যেক স্ত্রীলোকই যে তাঁহার মাতা। আমিও কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়। আমি প্রত্যেক স্ত্রীলোককে আমার স্বর্গীয় মা বলিয়া মনে করি।

(২৭) প্রদীপের নীচে ছায়া পড়ে, কিন্তু তাহার আলোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হয়, সেইরূপ অবতারগণ আপনাদিগকে বুঝিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের চতুর্দ্দিকস্থিত জনগণ তাঁহাদের শক্তিতে মুগ্ধ হয়।

(২৮) পঞ্জিকাতে বৎসরের বৃষ্টির কথা লিখিত থাকে, তুমি বই নিঙ্ড়াও একবিন্দু জলও পুস্তক হইতে বাহির হইবে না। পুস্তকে অনেক ধর্ম্মকথা লিখিত থাকে, কিন্তু কেবল পড়িয়া কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। পুস্তকে যে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিত আছে, তাহা কার্য্যতঃ পালন ও আচরণ করিতে হয়।

(২৯) কোন পরিবারের যুবতী বধূ যেমন তাহার শ্বশুর, শ্বাশুড়ী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করে, এবং নিজ স্বামীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসে, সেইরূপ তুমি যেমতেই যে দেবতার উপাসনা কর না কেন, সেই দেবতার প্রতি দৃঢ়চিত্ত থাকিবে; তাই বলিয়া অন্য দেবতাকে ঘৃণা করিও না—তাঁহাকেও ভক্তি করিবে।

(৩০) সৎলোকের ক্রোধ জলের উপর রেখার ন্যায়, এ ক্রোধ দীর্ঘ স্থায়ী হয় না।

(৩১) প্রশ্ন ঃ—ভগবান্ কোথায়? আমরা কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পারি?

উঃ।—সমুদ্রতলে শুক্তি আছে, সেই শুক্তির ভিতর মুক্তা আছে, সেই

মুক্তা লাভ করিতে গেলে তোমাকে পুনঃ পুনঃ সেই সমুদ্রমধ্যে ডুব দিতে হইবে। সেইরূপ বিশ্বময় ভগবান্ আছেন, তাঁহাকে পাইতে হইলে তোমাকে কঠোর অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩২) হয় কোন অজ্ঞাত স্থানে, না হয় কোন নির্জ্জন বনে অথবা নিজের মনে ভগবানকে ধ্যান করিবে।

(৩৩) আমরা আদ্যাশক্তি মহামায়াকে দেখিতে পাই না কেন? সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীগণ যেমন পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করেন, তিনিও সেইরূপ আমাদের স্থূল চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত বিশ্ব-সংসারের কার্য্য চালাইতেছেন। তিনি আমাদের সকলকেই দেখিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যাহারা তাঁহার ভক্তসন্তান, তাহারাই কেবল মায়ারূপ পর্দ্দা অপসারিত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়।

(৩৪) আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে তফাৎ কেমন, যেমন সঙ্গীতের একটি পদে ও সমস্ত সঙ্গীতে প্রভেদ। আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মণ্যদেবের একটী মাত্র সঙ্গীত লইয়াছে, আর হিন্দুধর্ম্ম সমস্ত সঙ্গীত-টুকু সমস্বরে গান করিতেছে।

(৩৫) ধানের বীজ হইতে ধানের গাছ অঙ্কুরিত ও উৎপন্ন হয়, কিন্তু ধানের খোসা আবশ্যকীয় বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় না। আবার খোসাবিহীন ধানের বীজ জমিতে বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় না কিংবা গাছও উৎপন্ন হয় না। যাহারা ধানের গাছ জন্মা-ইতে চায়, তাহারা খোসা বা তুষসমেত বীজ জমিতে বপন করে। আবার চাউল খাইতে গেলে ধানের তুষ ছাড়ান আবশ্যক। এইরূপ যাগযজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য আবশ্যক। এই পূজার্চ্চনাতেই সত্যের বীজ নিহিত।

(৩৬) যে পাত্রে পূর্ব্বে দধি রাখা হইয়াছিল, সেই পাত্রে দুধ রাখিতে কেহ সাহস করে না, কারণ তাহা হইলে দুধ দধিতে পরিণত হইয়া যায়। আবার সেই পাত্র রন্ধনকার্য্যের জন্যও অগ্নির উপর রাখা যায় না, কারণ তাহা হইলে তাহা ফাটিয়া যায়। এইজন্য যিনি অভিজ্ঞ গুরু, তিনি সাংসারিক লোকের প্রতি কোন মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন না।

(৩৭) একদা শিবপুরনিবাসী শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়! ঈশ্বর দর্শন করিলে কিরূপ অনুভব করেন, আমার সে কাহিনী শুনিতে বড় সাধ যাইতেছে।" পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, একদিন সমবয়স্কা দুইটী যুবতী প্রাতঃকালে পুষ্করিণীতে আসিয়া একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো! তোর ভাতার এসেছিল না। সে কহিল, "হাঁ"। সঙ্গিনী কহিল, "তুই কেমন সুখ পেলি?" সে কহিল, "সে কথা কি মুখে বলা যায়? তোর ভাতার যখন আস্‌বে, তখন তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি।" ঈশ্বরের রূপ কি, কেমন, সে কি বলিবার কথা? সে বাস্তবিক সম্ভোগের কথা, কথায় বলিবার উপায় নাই।

(৩৮) প্রত্যেক লোকই আপন আপন ধর্ম্মপথে চলিবে। একজন খ্রীষ্টান্ খ্রীষ্টানধর্ম্ম অনুসরণ করিবে, মুসলমান্ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। হিন্দুদিগের পক্ষে প্রাচীন আর্য্য প্রদর্শিত পথই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(৩৯) এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লীলাময় হরি নানাভাবে এখানে সর্ব্বদা লীলা প্রকাশ করিতেছেন। মাতা যেমন সন্তানের হাতে লাল চুশি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নানা পদার্থ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তান চুশি ফেলিয়া দিয়া, মা

বলিয়া চীৎকার করিলে, মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপস্থিত হন, আমরাও যদি পার্থিব মমতাবিহীন হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন করিতে পারি, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট উপস্থিত হন।

(৪০) এক ডুবে রত্ন না পাইলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করিও না। ধৈর্য্য-ধারণপূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপরে অবতীর্ণ হইবেই হইবে।

(৪১) স্প্রীংএর গদীর উপরে বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং উঠিলেই আবার সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ধর্ম্ম কথা যখন শুনে, তখন সংসারী মানবের মনেও ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে মনের আর সে ভাব থাকে না।

(৪২) মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটা উপায় দেখাইয়া দিতেছে।

(৪৩) প্রশ্ন ঃ—গেরুয়া বসন পরিধানের আবশ্যকতা কি ?

উ ঃ—গেরুয়া বসনের সহিত পবিত্র ভাবের সম্বন্ধ আছে। যেমন চটিজুতা ও ছিন্ন বসন পরিধানপূর্ব্বক রাস্তায় বেড়াইলে সহজে মনে দীনভাবের উদয় হয়, সেইরূপ গেরুয়া বসন পরিধান করিলে সহজে মনে সাধনার উপযোগী ভাব উপস্থিত হয়।

(৪৪) এক ব্যক্তি সমস্ত দিবস ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া অবশেষে দেখিল যে, এক বিন্দু জলও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, দূরে কতকগুলি গর্ত্ত ছিল, তাহা দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ যিনি বিষয় আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব মান-সম্ভ্রম, সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি

আসক্তি রাখিয়া উপাসনা করিতেছেন, আজীবন উপাসনা করিয়া অবশেষে তিনিও দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সকল আসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া তাঁহার সমুদয় উপাসনা বাহির হইয়া গিয়াছে। তিনি যে মানুষ সেই মানুষ পড়িয়া আছেন। একবিন্দুও উন্নতি করিতে পারেন নাই।

(৪৫) নষ্টা স্ত্রী, মাতাপিতা প্রভৃতি সমুদয় পরিজন মধ্যে বাস করিয়া এবং নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিলেও তাহার মন যেমন উপপতির প্রতি আকৃষ্ট থাকে, হে সংসারী মানব! তুমিও সেইরূপ মাতাপিতা প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া সমুদায় কার্য্যে ব্যস্ত থাক; কিন্তু তোমার মনকে সেই হরির প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিও।

(৪৬) হাড়গিলা অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার মন যেমন শ্মশান, তড়াগ প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ—নাস্তিক জ্ঞানীও অতি উচ্চ উচ্চ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার মন অসার পৃথিবীর ধনমানাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৪৭) ধনীদিগের গৃহে দাসীগণ প্রভুর সন্তান সন্ততিদিগকে মাতার ন্যায় লালনপালন করিয়া থাকে; কিন্তু মনে তাহারা নিশ্চয় জানে যে, ঐ সন্তানসন্ততিদিগের উপরে তাহাদের কোন অধিকার নাই। হে মানব! তুমিও তোমার সন্তানসন্ততিদিগকে যত্নের সহিত পালন করিও। কিন্তু মনে নিশ্চয়ই ধারণা করিতে চেষ্টা করিও যে, ঐ সকল কিছুই তোমার নহে।

(৪৮) পুস্তক হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে ভগবানে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্ত্তে পার্ব্বে না।

(৪৯) আমি মাকে বলি;—মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।

(৫০) লোকে যাহাদিগকে দুশ্চরিত্র বলে, তাদের ভিতর সাধুলোক থাক্‌তেও পারে।

(৫১) গঙ্গার কাছে গিয়া গঙ্গার জল স্পর্শ ক'রে বল, "গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শন ক'রে এলুম।" সব গঙ্গাটা—হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্ত্তে হয় না।

(৫২) মন আর মুখ এক করাই যথার্থ সাধনা। নতুবা মুখে বলিতেছি তুমি আমার সর্ব্বস্ব এবং মন বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জানিয়া বসিয়া রহিয়াছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।

(৫৩) দাদ যেমন চুলকালে সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির ক'রে তুলে, সংসারও সেইরকম। প্রথমে বড়ই সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির ক'রে দেয়।

(৫৪) কলসীতে জল পূরে সিকেয় তুলে রাখলে দিনকতক পরে জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখলে কোনকালে শুকোয় না। সেই রকম ঈশ্বরের ভিতর যে নিত্য ডুবে থাকে, তার প্রেম-ভক্তি শুকোয় না, কিন্তু দু'একদিনের প্রেম-ভক্তিতে যে নিশ্চিন্ত থাকে, সিকেয় তোলা জলের মতন তার প্রেমভক্তি দুদিন পরে শুকিয়ে যায়।

(৫৫) বাতাস চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে লইয়া যায়, কিন্তু কারো সহিত মেশে না। মুক্ত পুরুষও সেই রকম সংসারে থাকেন, কিন্তু সংসারের সহিত মেশেন না।

(৫৬) লোকের কাছে বক্তৃতা না করে আপনি ভগবানকে ভজনা কর্‌লেই যথেষ্ট ধর্ম্মপ্রচার করা হয়।

(৫৭) কুমীরের গায়ে তরবাল মার্‌লে, তরবাল যতই ধারাল

হউক না কেন তার গায়ে কিছুতেই লাগে না, সেইরূপ বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তা তাদের প্রাণের ভিতর যায় না।

(৫৮) গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা মিলে না এক।

(৫৯) ভগবানকে দেখ্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে নামে বিশ্বাস আর ভাল মন্দ বিচার করা চাই।

(৬০) পতঙ্গ যেমন আলো দেখ্‌লে আর অন্ধকারে থাক্‌তে চায় না, পিপ্‌ড়ে যেমন গুড় পেলে আর তা' ছেড়ে থাক্‌তে চায় না, সেইরূপ ভক্তও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দেয়, কিছুতেই রক্ষা করা যায় না।

(৬১) গ্যাসের আলো নানাস্থানে নানাভাবে জ্বলে, কিন্তু সব খানে এক জায়গা হ'তে। সেইরূপ সকল ধর্ম্ম আস্‌ছে এক ভগবান হ'তে, তাদের সাধনপ্রণালী কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়।

(৬২) বাসনা বিন্দুমাত্র থাক্‌তে ভগবানকে দর্শন করা যায় না।

(৬৩) মনুমেণ্টে উঠলে পরে নীচেকার সব সমান দেখায়, সেই-রূপ ভগবানকে পেলে আর ছোট বড় জ্ঞান থাকে না, সবাইকে সমান দেখা যায়।

(৬৪) ভক্ত শুক্‌নো দেশালাইয়ের মত, একটু ঘস্‌লেই তার প্রাণের ভিতর ভাব জেগে ওঠে। আর যার প্রাণে ভক্তি নাই, তার কাছে হাজার ভক্তির কথা বল্‌লেও তাহার প্রাণ তাতে একটুও নাচে না।

(৬৫) যেমন সব লোক একই সময়ে খেতে পায় না, কেউ খায় ন'টায়, কেউ দশটায়, কেউ দুটোয়, সেইরূপ ভগবানকেও সকলে

এক সময় দেখ্‌তে পায় না। কেউ কত কত জন্মগ্রহণ ক'রে তবে তাঁকে দেখ্‌তে পায় আর কেউ বা এক জন্মেই তাঁকে পায়।

(৬৬) হাঁসের ঠোঁটে কিরকম রস আছে, সে দুধেজলে মিশ্রিত থাকিলে, জল রেখে দুধ খায়, অন্য পাখীতে তাহা পারে না। সেই রকম ঈশ্বর মায়ায় মিশিয়ে আছেন, অন্যে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারে না, যাঁহারা পরমহংস তাঁহারাই মায়াকে ফেলিয়া ঈশ্বরকে লন।

(৬৭) প্রশ্ন :—এ দেহ যখন অসার ও অনিত্য, তখন সাধু ভক্তেরা এ দেহের প্রতি এত যত্ন করেন কেন?

উ :—খালি সিন্দুকের কেহ যত্ন করে না, যে সিন্দুকে মোহর, টাকা কি দামী জিনিস থাকে, সকলে তাহাকেই যত্ন করিয়া রক্ষা করে। যে হৃদয়ে তিনি বিরাজ করিতেছেন, যেখানে তাঁহার নিত্যলীলা প্রকাশ হইতেছে, সাধু ভক্তগণ সেই দেহকে যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

(৬৮) যোগী সন্ন্যাসীরা সর্পের মত। সর্প যেমন নিজের জন্য কখনও গর্ত্ত করে না, ইন্দুরের গর্ত্তে থাকে, একটা গর্ত্ত ভাঙ্গিলে আবার আর একটায় থাকে। যোগী সন্ন্যাসীরাও সেই রকম নিজের জন্য ঘর করেন না। পরের ঘরে আজ এখানে, কাল সেখানে করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

(৬৯) গরুর পালে অন্য জন্তু প্রবেশ করিলে গরু আসিয়া তাহাকে গুঁতাইয়া তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু আসিলে সকলে তাহার গা চাটাচাটি করে; সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁহারা উভয়ে আনন্দ পান এবং সে সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু অভক্ত আসিলে তাঁহার সহিত মিশেন না।

(৭০) সাধু হইলেই সাধুকে চিনিতে পারেন। যে সূতার কাজ করে, সে সূতা দেখিলেই কোন্ নম্বরের সূতা বলিয়া দিতে পারে।

(৭১) একজন সাধু সমাধিস্থ হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া আছেন। এমন সময় একজন চোর দেখিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "এ নিশ্চয় চোর, সমস্ত রাত্রি চুরি করিয়া এখন পড়িয়া আছে, এখনই পুলিশ আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, আমি পলায়ন করি।" একজন মাতাল দেখিয়া বলিল, "সমস্ত রাত্রি মদ্ টদ্ টানিয়া খানায় পড়িয়া আছে, আমি ইহাতে পড়িতেছি না।" শেষে একজন সাধু দেখিয়া চিনিলেন যে, ইনি একজন মহাসাধু—সমাধিস্থ অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তিনি তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন।

(৭২) অন্যকে মারিতে হইলে ঢাল তলওয়ারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিজেকে মারিতে হইলে সামান্য একটী নরুণ দিয়া হয়। লোককে শিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র পড়িতে হয়, কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ একটী কথায় বিশ্বাস করিলেই হয়।

(৭৩) যে পুকুরে অল্প জল, তাহার উপর হইতে আস্তে আস্তে জল খাইতে হয়, নাড়িতে নাই। নাড়িলে তাহার ভিতর হইতে ময়লা উঠিয়া জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। যদি পবিত্র হইতে চাও, তবে তুমি বিশ্বাস করিয়া সাধনা করিতে থাক, বৃথা শাস্ত্রবিচার ও তর্ক করিও না, ক্ষুদ্র মন গুলাইয়া যাইবে।

(৭৪) কাঁচা ময়দা গরম ঘিতে ফেলিয়া দিলে কল্‌কল্ করিয়া শব্দ হয়, কিন্তু যত ময়দা ভাজা হইতে থাকে, তত শব্দ কম হইয়া আসে। ভাজা হইলে আর শব্দ হয় না। অল্প জ্ঞান পাইলে মানুষ বক্তৃতা দিতে ও বাহ্য আড়ম্বর করিতে থাকে। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান হইলে আর আড়ম্বর থাকে না।

(৭৫) ধনী লোকের ঘরে দাসীরা মনিবের ছেলেদিগকে মার

মত পালন করে, কিন্তু মনে মনে তাহারা নিশ্চিত জানে যে, ঐ সকল ছেলেদের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। সেই রকম তুমিও তোমার ছেলেদের যত্নের সহিত পালন করিও, কিন্তু মনে মনে জানিও যে, ঐ সকলের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।

(৭৬) এক কাঠুরিয়া বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইত। হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহার দুঃখ দেখিয়া বলিলেন, "বাপু রে এগিয়ে যাও।" কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কিছু অগ্রসর হইয়া একটা চন্দন বন পাইল এবং সেদিন যত পারিল, চন্দনকাঠ কাটিয়া আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া অন্য দিনের অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইল। পরদিন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, ঠাকুর মহাশয় আমাকে চন্দন কাঠের কথা তো কিছু বলেন নাই, শুধু "এগিয়ে যাও" বলিয়াছিলেন। অতএব আমি এগিয়ে যাই। সে এগাইতে লাগিল এবং কিছুদূর গিয়া একটা তামার খনি পাইল। সেদিন যত পারিল তামা আনিয়া বেচিয়া আগের দিনের অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইল। কিন্তু সে তাহাতে না ভুলিয়া দিন দিন আরও যত এগাইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে রূপা, সোনা ও হীরার খনি পাইয়া মহাধনী হইয়া পড়িল। ধর্ম্মরাজ্যেরও ঐ কথা, যদি জ্ঞানী হইতে চাও, তবে এগিয়ে যাও। সাধনার কোন বিশেষ অবস্থা পাইয়া আহ্লাদে ভুলিও না। এগাইতে থাক, অমূল্য ধনে ধনী হইবে।

(৭৭) চারা গাছকে প্রথমে বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয়, না হইলে ছাগল গরু আসিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। গাছ একবার বড় হইলে আর সে ভয় থাকে না, তখন শত শত গরু ছাগল আসিয়া

তাহার তলায় আশ্রয় লয় ও তাহার পাতা খায়। সাধনার প্রথম অবস্থায় আপনাকে কুসঙ্গ, বিষয়বুদ্ধি ও সংসার ইত্যাদি হইতে রক্ষা করিতে হইবে, না করিলে তোমার সমুদায় ধর্ম্মভাব নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কিন্তু একবার সিদ্ধ হইলে আর কোন ভয় নাই। হাজার হাজার সংশয় ও কুসঙ্গ তখন তোমায় নষ্ট করিতে পারিবে না, বরং অনেকে তোমার কাছে আসিয়া শান্তি পাইবে।

(৭৮) হাতীর গা পরিষ্কার করিয়া দিলে, তখনই ময়লা করিয়া ফেলে। কিন্তু গা পরিষ্কার করিয়া যদি ঘরের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে আর ময়লা করে না। সংসারের মধ্যে যতই পবিত্রতা লাভ কর না কেন, আবার অপবিত্র হইয়া পড়িবে। মনকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের উপর বদ্ধ করিয়া রাখিলে পবিত্র থাকিবে, সংসারে ছাড়িয়া দিলে আবার ময়লা হইয়া যাইবে।

(৭৯) মরিবার আগে মনে যে ভাব হয়, পরজন্মে সেই আকার ধরে, সেইজন্য সাধনার দরকার। ক্রমাগত অভ্যাসে মনে আর কোন ভাব উঠে না, তখন ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন ভয় থাকে না।

(৮০) বানরের বাচ্ছা আপনার মাকে জড়াইয়া থাকে, কিন্তু বিড়ালের ছানা প'ড়ে প'ড়ে কেবল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে। বানরের বাচ্ছা যদি হাত ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে পড়িয়া যায়, কারণ সে নিজে মাকে ধরিয়া আছে। আর বিড়ালের ছানাকে মা মুখে করিয়া ধরিয়া থাকে, তাহার আর পড়িবার ভয় নাই। প্রথমটী পুরুষকার, শেষটী নির্ভর।

(৮১) হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা মাথায় করিয়া চারি পাঁচটী জল-ভরা কলসী লইয়া যায়, পথে আত্মীয়দের সঙ্গে গল্প করে, সুখ দুঃখের কথা কয়, কিন্তু তাহাদের মন থাকে মাথার কলসীর উপর, যেন সেটী পড়িয়া না যায়। ধর্ম্মপথের পথিকদেরও সকল অবস্থার ভিতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখিতে হইবে, মন যেন তাঁহার পথ হইতে সরিয়া না যায়।

(৮২) যে রকম জিনিস লাভ করিতে চাও, সেই রকম সাধনা কর, তাহা না করিলে কি হইবে? দুধে মাখন আছে বলিয়া চীৎকার করিলে কখন মাখন বাহির হইবে না। যদি মাখন বাহির করিতে চাও, তবে দুধকে দই কর, তাহাকে মন্থন কর, মাখন বাহির হইবে। সেই রকম যদি ঈশ্বর লাভ করিতে চাও, সাধনা কর, ঈশ্বর দর্শন পাইবে। শুধু শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া গোলমাল করিলে কি হইবে?

(৮৩) প্রশ্ন :—শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?

উত্তর :—মানুষ হাড়মাসের ঘরকন্না করে, এ দেহখানা কেবল হাড়, মাস, পূঁয, রক্ত, মল ও মূত্রের আধার—এ সকল বিচার করিলে তাহার উপর আর আসক্তি থাকে না।

(৮৪) বাছুর বিশ বার পড়ে, বিশ বার উঠে, তারপর দাঁড়াইতে পারে। সাধনা করিতে গেলে অনেক বার পড়িতে হয়, তারপর সিদ্ধ হয়।

(৮৫) সমুদ্রে এক প্রকার ঝিনুক আছে, তাহারা সর্ব্বদা হাঁ করিয়া জলের উপরে ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাহাদের মুখে পড়িলে তাহারা মুখ বন্ধ করিয়া একেবারে জলের নীচে চলিয়া যায়, আর উপরে আইসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও

সেই রকম গুরুমন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পাইয়া সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবিয়া যায়, আর অন্যদিকে চাহিয়া দেখে না।

(৮৬) স্রোতের জল বেগে যাইতে যাইতে এক এক জায়গায় ঘুরিতে থাকে, কিন্তু তখনই আবার সোজা হইয়া বেগে চলিয়া যায়। পবিত্রমনা ধার্ম্মিকদেরও মনে কখন কখন অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পায় না। শীঘ্র চলিয়া যায়।

(৮৭) একজন পাতকূয়া খুঁড়িতে গিয়া দুই হাত মাটী কাটিয়াছে, এমন সময় আর একজন আসিয়া বলিল, "ভাই, তুমি বৃথা পরিশ্রম করিতেছ কেন? ইহার নীচে জল পাইবে না, শুধু বালি বাহির হইবে।" সে তাহার কথা শুনিয়া সে জায়গা ছাড়িয়া আর এক জায়গায় মাটী খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে আর একজন আসিয়া বলিল, "ভাই, এখানে আগে কূয়া ছিল, বৃথা কষ্ট করিতেছ কেন? কিছু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে কাটলে সুন্দর জল বাহির হইবে।" সে তখনই তাহা করিল। সেখানে আর একজন আসিয়া বারণ করিল। এই রকম সে যত জায়গা ঠিক করে, ঐ রকম বাধা পায়, তাহার আর কূয়া কাটা হইল না। ধর্ম্মপথেও এইরূপে অনেকে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। আজ যাহা বিশ্বাস করিলেন, বিপদে কষ্টপরীক্ষায় পড়িয়া কল্য তাহা ত্যাগ করিলেন। শেষে হয় একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়িলেন কিংবা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ জীবনে ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।" (একটা ধ'রে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে থাকৃতে হয়।)

(৮৮) পাথর হাজার বৎসর জলের মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও তাহার ভিতর জল প্রবেশ করে না, কিন্তু মাটীতে জল লাগিলে তখনই

উহা গলিয়া যায়। বিশ্বাসী হৃদয় হাজার হাজার পরীক্ষার মধ্যে পড়িলেও হতাশ হয় না, কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ সামান্য কারণেই বিচলিত হয়।

(৮৯) রেলগাড়ী ভারী ভারী বোঝা বহন করে; বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানও এই সংসারের ভার মাথায় লইয়া অনায়াসে তাঁহার উপর ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া চলিয়া যায়, কোন কষ্ট বোধ করেন না।

(৯০) বালকের স্বভাব, যেমন টাকা কড়ি ফেলে পুতুল নেয়; বিশ্বাসী ভক্ত তেমনি সংসারের ধনমান ফেলে ঈশ্বরকে নিতে চায়।

(৯১) বালক যেমন খুঁটি ধরিয়া বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে থাকে, পড়িবার ভয় করে না; সংসারে সেই রকম ঈশ্বরকে ধরিয়া কাজ কর, নিরাপদে থাকিবে।

(৯২) এঁটো শালপাতা যেমন ঝড়ে উড়িয়া বেড়ায়, নিজে কোন চেষ্টা করে না, সেই রকম যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাকে তিনি যেমন চালান সেইমত চলে; তাহার নিজের কোন চেষ্টা থাকে না।

(৯৩) বাপ এক ছেলেকে কোলে লইয়াছে, আর এক ছেলে বাপের হাত ধরিয়া মাঠ দিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে একটা চিল দেখে, যে ছেলে বাপের হাত ধরিয়াছিল সে হাত ছেড়ে আহ্লাদে হাত তালি দিয়া "বাবা, কেমন পাখী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু হাত ছেড়ে দেওয়াতে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল, আর যে ছেলে বাপের কোলে ছিল, সেও চিল দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল, কিন্তু পড়িল না, কারণ বাপ তাহাকে ধরিয়া আছে। প্রথমটী পুরুষকার, শেষটী নির্ভর।

(৯৪) সূর্য্যকিরণ সব জায়গায় সমান হইলেও জলের ভিতর,

আর্সীতে, ও সকল স্বচ্ছ জিনিসের ভিতর বেশী উজ্জ্বল দেখায়। ঈশ্বরের প্রকাশ সকল হৃদয়ে সমান হইলেও সাধুদের হৃদয়ে বেশী প্রকাশ পায়।

(৯৫) গুটি পোকা যেমন নিজের ঘরে নিজে বদ্ধ হয়, তেমনই সংসারী জীব আপনার ঘরে আপনি বদ্ধ হয়। যেমন প্রজাপতি হইলে ঘর কেটে বাহির হয়, তেমনই বিবেক বৈরাগ্য হইলে সংসার-বদ্ধ জীব ঘর থেকে বাহির হইতে পারে।

(৯৬) সাধুসঙ্গ চাউলের জলের মত। চাউলের জলে নেশা কাটায়। যাহার অত্যন্ত নেশা হইয়াছে, চাউলের জল খাওয়াও, দেখিবে তাহার নেশা চলিয়া যাইবে। সংসার-মদে মত্ত জীবের নেশা কাটাইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

(৯৭) যেমন হাতীর দাঁত বাহিরে এক রকম, আর ভিতরে আর এক রকম। কপট ধার্ম্মিকের ভাবও সেই রকম। মুখে এক, ভিতরে অন্য রকম।

(৯৮) পার্থিব লাভের আশায় সংসারীরা অনেক রকম ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু বিপদ, দুঃখ, দারিদ্র্য ও মৃত্যু আসিলে তাহারা সব ভুলিয়া যায়। পাখী সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বিড়ালে ধরিলে কৃষ্ণনাম ভুলিয়া কঁ্যা কঁ্যা করিতে থাকে।

(৯৯) যেমন আরসিতে ময়লা পড়িলে মুখ দেখা যায় না, তেমনই হৃদয়ে ময়লা পড়িলে ঈশ্বরের ছবি পড়ে না। ময়লা মুছিয়া কৌশলে যেমন আরসিতে মুখ দেখা যায়, তেমনই হৃদয় নির্ম্মল হলে ঈশ্বর প্রকাশ পান।

(১০০) জমিদার যত বড় হউন না কেন, প্রজা যদি তাঁহাকে সামান্য দ্রব্য উপহার দেয়, তবে তিনি যেমন তাহা আদরের সহিত

গ্রহণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর মহান হইলেও মানুষের তুচ্ছ উপহারও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(১০১) যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাইবার অনেক পথ আছে; সেইরূপ ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়া যাইতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে।

(১০২) রাজার কাছে যাইতে হইলে সিপাই শান্ত্রীর অনেক তোষা-মোদ করিতে হয়। ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইলে নানা উপায়ে সাধন, ভজন ও সৎসঙ্গ করিতে হয়।

(১০৩) যে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছে, সে কি সামান্য মুটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া সুখ পায়? অর্থাৎ যে ভগবান পাইয়াছে তাহার মন সামান্য জিনিসে যায় না।

(১০৪) যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার সব আছে। যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার কিছুই নাই।

(১০৫) উঁচুতে উঠিলে তাহার সকলই যেমন এক সমান দেখায়, সেইরূপ ঈশ্বর লাভ হইলে, তাহার আর ভাল মন্দ বিচার থাকে না।

সমাপ্ত।

ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর
জন্য অনুমোদিত।

সতী-কথা-গ্রন্থাবলী।

সতী—॥০
সীতা—॥০
দময়ন্তী—॥০
সাবিত্রী—॥০
শৈব্যা—॥০
দ্রৌপদী—॥৵০
শর্ম্মিষ্ঠা—॥০
সুভদ্রা—॥০
সংযুক্তা—॥০
উষা—॥০
পার্ব্বতী—॥০
শকুন্তলা—॥০
সতী-রাণী—১৲
বেহুলা—॥০
সতী-চিত্র—১॥০

ভক্ত-কথা-গ্রন্থাবলী।

ভীষ্ম—॥০
প্রহ্লাদ—॥০
ধ্রুব—॥০
চন্দ্রহাস—॥০
অর্জ্জুন—॥০
লবকুশ—।৵০
শ্রীকৃষ্ণ—॥০

জীবনামৃত সিরিজ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—৶০
স্বামী বিবেকানন্দ—৶০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৶০
রাজা রামমোহন রায় ৶
চিত্তরঞ্জন—৶০
আশুতোষ—৶০

প্রকাশক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা